ইনসাইড ‘র’

ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়

মূল : অশোকা রায়না
অনুবাদ ও সম্পাদনা : আবু রুশ্‌দ

Radiant Leaf
Publishing

সূচিপত্র

গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান	১২
যাত্রা হলো শুরু	১৭
‘র’-এর গঠন প্রক্রিয়া	২৩
গুপ্তচরবৃত্তির কলাকৌশল	২৮
রাখঢাক ছদ্মাবরণ	৫৬
অপারেশন বাংলাদেশ	৬১
অপারেশন সিকিম	৭৮
পারমাণবিক অনুমোদন	৮৮
‘র’-এর ভাগবাটোয়ারা	৯৩
বৈদেশিক নীতিমালা	১০৩
গুপ্তচরবৃত্তি কি আদৌ প্রয়োজনীয়?	১০৮
ছক ও ছবি	১২৪

অধ্যায় : ১

গুপ্তচর প্রতিষ্ঠান

The Institute of Spies

'আমি গুপ্তচর,' 'তুমি গুপ্তচর'-এ ধরণের লুকোচুরি খেলা বহুদিন যাবত পৃথিবী জুড়ে চলছে। 'পাতলা বা অকিঞ্চিৎকর' আবরণে সত্য পরিচয় ঢেকে রেখে গুপ্তচরবৃত্তি চালানো ইন্টেলিজেন্স জগতে বহুল আলোচিত একটি পদ্ধতি, যদিও এ 'ঢেকে রাখা' স্বীকৃত নৈতিকতার মানদণ্ডে বড় ধরণের প্রশ্নসাপেক্ষ কোনো ব্যাপার নয়। অন্যদেশের গুপ্তচর নিজদেশে প্রায় খোলাখুলিভাবে শুধু 'যৎকিঞ্চিৎ পাতলা আবরণের' (Cover, কূটনৈতিক পরিচয়) আড়ালে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকে। কিন্তু যখনই ঐ 'পাতলা আবরণ'টি খসে যায় তখন নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, সে গ্রেপ্তার হতে চলেছে।

সকলের মনেই একটি মৌলিক প্রশ্ন জাগতে পারে ''গুপ্তচর কেন?'' এ ক্ষেত্রে সহজ স্বাভাবিক উত্তর হচ্ছে ''টিকে থাকার জন্য''।

ক। প্রাচীন যুগে গুপ্তচরবৃত্তি (Spies in Ancient Times)

টিকে থাকার সংগ্রাম, পৃথিবীতে প্রাণ বা জীবন উদ্ভবের দিনের মতোই পুরানো। প্রাচীন প্রস্তর, লৌহ ও তাম্র যুগে আমরা পাথর ও ধাতব অস্ত্রের সন্ধান পাই। এ সব অস্ত্র-শস্ত্র শুধু খাদ্য সংগ্রহের জন্য নয় বরং হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ ও পরবর্তীতে সহযোগী মানুষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। টিকে থাকার সংগ্রাম শুধু অস্ত্রের গুণগত মান ও তার ব্যবহারের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল না বরং শত্রুর চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞানের ওপর অর্থাৎ কখন, কোথায় এবং কিভাবে শত্রু আক্রমণ চালাবে এ সমস্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আবর্তিত হয়েছে।

এ ধরণের তথ্য সংগ্রহের উপর টিকে থাকা ও বিজয় ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং তথ্যের অভাব ও দুষ্প্রাপ্যতা পরাজয় ও মৃত্যু ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। সুতরাং টিকে থাকার এ সংগ্রামে কিছু লোক নিজেদের তথ্য সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত করলো যারা 'জাসুস' (Spy) অর্থাৎ 'গুপ্তচর' হিসেবে পরিচিত। এ পদ্ধতি ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করে এবং বর্তমানে যাকে আমরা 'এসপায়োনেজ' বলে জানি সে অভিধায় ভূষিত হয়।

প্রাচীন ভারতীয় পুঁথিপত্রেও গুপ্তচরবৃত্তির বিভিন্ন কাহিনীর উপস্থিতি লক্ষণীয়। 'মনুর' চরিতাবিধানে এ ব্যাপারে স্পষ্ট উল্লেখ্য যে, ''রাজা বা শাসনকর্তা অবশ্যই নিজদেশে ও তার শত্রুদেশে গুপ্তচরের মাধ্যমে খবরাখবর সংগ্রহ করবেন।'' বেদ, মহাভারত, রামায়ণেও এরূপ বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়; রামায়ণে বিদেশি দেশগুলোয় গুপ্তচর মারফত লক্ষ্য রাখার জন্য বলা হয়েছে। তদ্রুপ মহাভারতে দুর্যোধনের গুপ্তচরবৃত্তির উদাহরণ

পাওয়া যায়। বাইবেলে হজরত মূসা (আ.) এর জাজের-এ গুপ্তচর পাঠানোর উল্লেখ্য আছে। (Nam xxi 32)।

খ। সান জু (San Tzu)

কখন এবং কোথায় একটি পূর্ণাঙ্গ এসপায়োনজ নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে তা বলা আজ অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার; বিশেষ করে আমরা যখন যিশু খ্রিষ্টের জন্মের শত শত বছর পূর্বের ঘটনাবলী নিয়ে অনুসন্ধান করি। রিচার্ড ডিকেন তাঁর ‘A History of the Chinese Secret Service’-এ উল্লেখ করেছেন, যিশু খ্রিষ্টের জন্মের ৫১০ বছর পূর্বে ‘সান জু’, ‘পিং ফা’ (Pin Fa) বা ‘Principle of War’ শীর্ষক বইয়ে জানামতে সর্বপ্রথম যুদ্ধের কলাকৌশল ও এসপায়োনেজ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করেন। ওই বইটিতে বিশেষভাবে একটি গুপ্তচর সংস্থার সংগঠন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। যদিও এ ব্যাপারে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয় তথাপি একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, গুপ্তচরবৃত্তি সম্বন্ধীয় ওই গ্রন্থটিই সবচেয়ে পুরোনো লিখিত নথি হিসেবে স্বীকৃতি পাবার দাবিদার।

‘Principle of War’ বইয়ে ‘সান জু’ পাঁচ প্রকার গুপ্তচরবৃত্তি ও পাঁচ ধরণের ‘গুপ্তচর’ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। এরা হচ্ছে যথাক্রমে-

স্থানীয় গুপ্তচর (Local Spy)

শত্রুদেশে ভালো আচরণ ও সহৃদয় ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের মন জয় করে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকে এমন ব্যক্তি।

অভ্যন্তরীণ গুপ্তচর (Internal Spy)

শত্রুদেশের বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তাদের ‘তথ্যের সূত্র’ হিসেবে ব্যবহার করার মাধ্যমে তদের গুপ্তচর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

রূপান্তরিত গুপ্তচর (Converted Spy)

শত্রুদেশীয় গুপ্তচরদের ঘুষের মাধ্যমে তাঁর নিজ সংস্থায় ভুল তথ্য পাচারে প্ররোচিত করা ও তাঁর নিজ জনগণের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা।

অনুপযুক্ত বা বাতিল গুপ্তচর (Condemned Spy)

যে সমস্ত গুপ্তচর শত্রু দ্বারা বন্দী হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল তথ্য প্রদান করে।

সাধারণ গুপ্তচর (Ordinary Spy)

সাধারণ নিয়মিত ক্যাডারভুক্ত সশস্ত্র বাহিনীর গুপ্তচর।

গ। কৌটিল্য’র আর্থশাস্ত্র (Kautilya’s Arthashastra)

ভারতে কৌঠিল্যের ‘আর্থশাস্ত্র’ গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কিত লেখনীর জগতে সবিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য। কৌটিল্য ইতিহাসে ‘বিষ্ণুগুপ্ত’ ও ‘চাণক্য’ নামেও সমধিত পরিচিত।

শ্যামসাস্ত্রী তাঁর ‘আর্থশাস্ত্রে’র অনুবাদে এ বইটির রচনাকাল ৩২১ খ্রিষ্টপূর্ব সাল হতে ৩০০ শত খ্রিষ্টপূর্ব সালের মধ্যে বলে মত প্রকাশ করেছেন।

কৌটিল্য অত্যন্ত সুন্দর লৈখিক বর্ণনার মাধ্যমে ‘মৌর্য’ও ‘মৌর্য পরবর্তী’ রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর বইয়ে বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ্য করেছেন।

কৌটিল্যের মতানুযায়ী গুপ্তচরদের প্রাথমিকভাবে দু’ভাগে ভাগ করা যায়। যারা ‘স্থানীয় এজেন্ট’ ও ‘পরিব্রাজক বা ভ্রাম্যমাণ এজেন্ট’ (এরা আবার তত্ত্বাবধায়ক এজেন্ট রূপেও চিহ্নিত) হিসেবে পরিচিত। ‘স্থানীয় এজেন্ট’ তার কর্তৃত্বাধীনে যাদের নিয়োজিত করবেন তারা বিভিন্ন আবরণে ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত। এরা হলো ‘শঠ/অসৎ শয্য’, ‘সন্ন্যাসী’, ‘গৃহস্বামী/গৃহস্থ’, ‘ব্যবসায়ী’ এবং তপশ্চর্যায় নিয়োজিত ‘যোগী/তাপস’ শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব।

আবার ‘পরিব্রাজক’ বা ‘ভ্রাম্যমাণ এজেন্টের’ আওতায় আসা গুপ্তচররা হচ্ছেন ‘সতীর্থ/সহযোগী গুপ্তচর’, ‘জনরোষ প্রজ্বলনকারী গুপ্তচর’, ‘বন্দী গুপ্তচর’ এবং ‘যাদুকর মহিলা গুপ্তচর’। কৌটিল্য এ সবের সাথে পুরোহিত ও সন্ন্যাসিনী গুপ্তচরের বিবরণও তাঁর বইয়ে উল্লেখ্য করেছেন; যা, তাঁর গুপ্তচর হিসেবে বিভিন্ন ও ব্যাপক প্রকৃতি বা পেশার লোকদের নিয়োজিত করার চাতুর্যপূর্ণ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটায়।

যদিও কৌটিল্য একটি সুশৃঙ্খল রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিলেন কিন্তু জনগণের ‘ধর্মীয় অনুভূতির’ নীতিজ্ঞান বর্জিত যত্রতত্র ব্যবহারে তাঁকে যথেষ্ট প্ররোচণা দিতে দেখা যায়। আবার গুপ্তচররা অসংখ্য অগণিত ছদ্মাবরণে লুকিয়ে কাজে নিয়োজিত থাকায় একে অন্যের সাথে বাস্তবসম্মত উপায়ে যতদূর সম্ভব অপরিচিত থাকাই বিধেয় বলে কৌটিল্য মনে করেন।

রাজা কৌটিল্য সবসময় শুধু একজন গুপ্তচরের সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করতে নিষেধ করতেন। তিনি এসপায়োনজে পাঁচটি স্তম্ভের বর্ণনা দিয়েছেন যা বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ততথ্যাদি পরীক্ষণ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ ইন্টেলিজেন্স বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং ‘সাইফার’ (গোপন লিপি) ও ‘বহনকারী কবুতর’-এর মাধ্যমে গুপ্তচররা ইন্টেলিজেন্স তথ্যাদি প্রেরণ করবে।

গুপ্তচরদের অসংখ্যা দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাদের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চালচলন, কর্তব্য সম্পাদন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হয়। রাজ্য ও রাজা সম্পর্কে জনোপলব্ধি রাজাকে জানাতে হয় এবং তাঁরা বর্বরতা ও অপরাধ শনাক্ত করার মাধ্যমে ন্যায়বিচার ও প্রশাসনকে সহায়তা করে থাকেন। সর্বশেষ কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, তারা পার্শ্ববর্তী দেশের রাষ্ট্রীয় ঘটনাবলীর উপর নিখুঁত তথ্য সংগ্রহ করবেন ও তাদের কৌশল শনাক্ত করে ধ্বংসের মাধ্যমে শত্রুর সাফল্যকে অকার্যকর করে দেবেন।

বিদেশী রাষ্ট্রসম্পর্কিত এসপায়োনেজ ব্যাপকভাবে তিনটি স্তরের ওপর নির্ভরশীল, যা বিশেষভাবে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক বিষয়াদির সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

অধ্যায় : ৩

‘র’-এর গঠন প্রক্রিয়া

The Coming of RAW

‘র’ তার ‘ছদ্মবেশি রূপের’ প্রতিবিম্ব লুকিয়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল; কিন্তু ১৯৬৯ সালে যখন কংগ্রেস ভেঙে যায়, তখন সরকারের পূর্ববর্তী সদস্যদের রাজনৈতিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়, তাঁরা ‘র’ সম্পর্কে বিভিন্ন কথাবার্তা বলা আরম্ভ করেন। ‘ইলাসট্রেটেড উইকলি অব ইন্ডিয়ার’ জুলাই সংখ্যায় বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে উল্লেখ্য করা হয় যে, ভারতীয় প্রচার মাধ্যমসমূহ ভারতের গুপ্ত সংস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্যক অবগত আছে। এরপর ‘বিশেষ সংবাদ’ সংগ্রহ ও ছাপার জন্য প্রচার মাধ্যমে তীব্র আলোড়ন ও চিৎকার চেঁচামেচির সৃষ্টি হয় এবং বিভিন্ন সংবাদপত্রে একটির পর একটি ‘গল্প’ ছাপা হতে থাকে। ঠিক তখনই ‘র’-এর প্রধান হিসেবে ‘কাও’-এর নাম উচ্চারিত হতে শোনা যায়।

ক। ‘র’ গঠনে কাও ও শংকর নায়ারের মিলিত প্রচেষ্টা (Kao With Sankaran Nair Build RAW)

‘র’-এর প্রধান পদটির জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া ছিল একটি অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ অভিজ্ঞতা ও গুপ্তচরবৃত্তির বিশেষ নৈপুণ্যে পারদর্শী খুব কম লোকই শনাক্ত করা সম্ভব ছিল। অবশেষে সকলে কাও-এর দিকে তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন এবং ভারতীয় সরকারও তাঁর থেকে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত কোনো ব্যক্তির সন্ধান না পেয়ে তাঁকে নিয়োগ দান করেন।

রামেশ্বর নাথ কাও আই বি (IB) তে তাঁর কার্যকালে গুপ্তচরবৃত্তি ও গোয়েন্দা জগতে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিরূপে সকলের নজর কাড়তে সমর্থ হন, যিনি নেহরুর সময় ষাট দশকের মধ্যভাগে মাঠপর্যায়ে কর্মরত ছিলেন। তখন ১৯৬০ সালের ১ জুলাই ঘানা সদ্য স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে প্রেসিডেন্ট নক্রুমা ঘানায় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থা গঠনের জন্য ভারতের সাহায্য লাভের আশা প্রকাশ করেন। নেহেরু এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যান এবং এর পরপরই দু’জন কর্মকর্তা যথাক্রমে আর এন কাও ও কে শংকর নায়ারকে প্রেষণে (Deputation) ঘানায় পাঠানো হয়। এ দু’ভদ্রলোকই পরবর্তী বছরগুলোতে এলোমেলো অবস্থা থেকে ঘানার গুপ্তর সংস্থার সাংগঠনিক কাঠামো গড়ে তোলেন। তাদের কঠিন পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে শূন্য অবস্থা থেকে ঘানার গুপ্ত সংস্থা একটি অবয়ব লাভে সক্ষম হয়। কাও এর অবকাঠামো রূপায়ণ করেন ও ভিত্তিস্থাপনের পর নায়ার তাঁর ক্রমাগত চেষ্টায় ‘ঘানা গুপ্তচর সংস্থা’ সচল করে তুলতে সক্ষম হন।

তাদের ঘানায় অর্জিত সুনাম ও অতীতের মাঠপর্যায়ের দক্ষতা তাদের একটি সম্মানজক অবস্থানে পৌঁছতে সাহায্য করে। আট বছরের মধ্যে (ঘানার কাজ করার পর) তাদের যথারীতি মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতাধীন R. and A. W-এ (Research & Analysis Wing) দায়িত্বশীল আসনে নিয়োগ করা হয়। অবশেষে ১৯৬৮ সালের ২১ সেপ্টেম্বর R. and A. W গঠনের চূড়ান্ত আদেশ প্রদান করা হয়। বড় কোনো হৈ চৈ ছাড়াই কাও ও নায়ারসহ আরো ২৫০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী IB থেকে ‘র’-এর ‘ছায়ায়’ বদলি হয়ে আসেন।

তাৎক্ষণিকভাবে ‘র’-এর কার্যালয় ও আনুষঙ্গিক স্থাপনার জন্য স্থান সংকুলান প্রাথমিক অসুবিধার সৃষ্টি করে ও রাজধানী নয়াদিল্লি ততোদিনে অসংখ্য অফিস-আদালতের ভারে নিমগ্ন প্রায়। তাই শুরুতে কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের উত্তর ব্লকে ‘র’-এর কার্যক্রম শুরু করতে হয় এবং দক্ষিণ ব্লকের তথাকথিত ‘স্পেশাল উইং’-এ কাও তাঁর নিজস্ব অফিস স্থাপন করেন। অতঃপর অবকাঠামো অপরিবর্তিত রেখে কিছু সংস্কার সাধন করা হয় এবং পৃথক আরেকটি ‘ক্যাডার’ গঠনের পরিকল্পনা নেয়া হয়।

গোয়েন্দা কার্যক্রমের শুরুতে, ভারতের প্রাথমিক মাথাব্যথা পাকিস্তান ও চীন সংক্রান্ত ডেস্কের পুনর্গঠন ও উন্নয়ন সাধন জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। ‘রাও ও সিং কমিশন’ ১৯৬৫ সালের ব্যর্থতার জন্য সংগৃহীত গোয়েন্দা তথ্য ও এর গবেষণা এবং পর্যালোচনার মধ্যে দুস্তর ব্যবধানকে দায়ী বলে মত প্রকাশ করেন। শংকর নায়ার, যিনি পূর্বে IBতে পাকিস্তান ডেস্কে কর্মরত ছিলেন, তিনি এ সব ‘ব্যবধান’ চিহ্নিত করতে ও এর সমাধান দিতে সক্ষম হন। পূর্বের চিন্তাধারা অনুযায়ী IB থেকে ‘র’-এ লোক নিয়োগ স্থগিত করে তৎপরিবর্তে বিভিন্ন সংস্থা ও বিশেষ পেশায় দক্ষ লোকদের ‘বিশেষ কাজের’ জন্য বাছাই করা হয়। এ পদক্ষেপ পরবর্তীতে ব্যাপক বিদ্বেষ ও রেষারেষির জন্ম দেয় কারণ ‘অন্য সংস্থার ও বিশেষ পেশায় দক্ষ ব্যক্তিত্বের গোয়েন্দা পেশায় আদৌ প্রয়োজন আছে কিনা’ এ নিয়ে নানাজন নানা প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

‘র’ ১৯৬৮ সালে-এর প্রাথমিক স্তরে দুটি সংস্থার সাথে তীব্র প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছিল। এ দুটো সংস্থা ছিল ব্রিগেডিয়ার ভদ্র পরিচালিত ‘সেনা গোয়েন্দা পরিদপ্তর’ এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়; বিশেষ করে ভারতীয় বৈদেশিক সার্ভিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস ভেঙে যাওয়ায় সরকারি অবকাঠামোর পুনর্গঠন করা হয় ও মুখ্যতঃ অর্থ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন রাজস্ব গোয়েন্দা শাখা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে স্থানান্তরিত হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার দায়িত্ব (CBI) জনশক্তি বিভাগের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং সকলের ‘হৃদয় জ্বালা’ সৃষ্টি করে চিরদিনের জন্য ‘র’ প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি নিয়ন্ত্রণে মন্ত্রিপরিষদ মন্ত্রণালয়ে (এর) জায়গা করে নেয়।

‘র’-এর কার্যক্রম দিন দিন সম্প্রসারিত হতে থাকে। ১৯৬৯ সলে ২৫০ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ এর বার্ষিক বাজেট ছিল দুই কোটি রুপি। তবে অল্পসময়েই এর বরাদ্দ ১০

কোটি রুপিতে উন্নতি হয় (যদিও এ খসড়া আনুমানিক হিসেবমাত্র, আসল হিসেব জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে কখনই প্রকাশ করা হবে না) এবং লোকবল ৭০০০ এ বৃদ্ধি পায়। ভারত সে সময় প্রতিবছর মাথাপিছু মাত্র ২০ পয়সা বৈদেশিক গোয়েন্দাবৃত্তির জন্য খরচ করে। 'র' প্রধানকে ক্রমান্বয়ে আরো অধিক অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করে সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয় এবং তিনি তাঁর সকল কাজের জন্য সরাসরি একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর নিকট দায়বদ্ধ থাকেন। এ দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে আমলাতান্ত্রিক 'লাল ফিতার বেড়াজাল ছিন্ন করে' দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সহজতর হয় এবং সংস্থায় সাংগঠনিক সাবলীলতা ফিরে আসে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শুধু 'গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহকারী' সংস্থা হিসেবে 'র'-এর নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্তু পরে পররাষ্ট্র নীতির আওতায় পরিচালিত আরেকটি বিশেষ অপারেশনাল শাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এ পরিকল্পনা ভবিষ্যতে অত্যন্ত কার্যকর ফল লাভে সক্ষম হয় (বাংলাদেশ ও সিকিম অপারেশন এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত)।

খ। অপারেশনাল শাখা (The Operational Arm)

ভারতীয় বৈদেশিক গোয়েন্দা সংস্থায় 'স্পেশাল অপারেশন ব্রাঞ্চের' 'বিশেষ অপারেশনাল শাখা' গোয়েন্দা জগতে কোনো নতুন সংযোজন নয়। এ রকম একই ধরণের শাখা সি আই এ, কেজিবি ও বৃটিশ গোয়েন্দা বাহিনী এস আই এস (Sceret Intelligence Service)-এও রয়েছে।

এ ধরণের অপারেশনাল শাখা সময়ে সময়ে যখন প্রয়োজন হয় তখন ব্যাপক গোয়েন্দা নীতিমালা প্রণয়নে বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়। যদিও 'র' ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থা সাধারণত প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োজিত থাকার চেষ্টা করে কিন্তু অনিবার্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রচলিত ধারার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে, যা ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে এবং এ রকম কোনো কোনো ক্ষেত্রে 'অপারেশন' সফল নাও হতে পারে। এখানে কিছুদিন পূর্বে সি আই এ পরিচালিত 'জিম্মি উদ্ধারের' (ইরানে মার্কিন দূতাবাসে আটক জিম্মি উদ্ধার প্রচেষ্টা) ব্যর্থতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য করা যায়।

কিন্তু সব সময় এটা ভাবা ঠিক নয় যে, বিশেষ অপারেশন সম্পূর্ণ অপারেশনের সাফল্য ব্যর্থতার নিয়ামক। ইরানের 'জিম্মি উদ্ধারের' অপারেশনাল ব্যর্থতা সি আই এ'র ইরানে সম্পৃক্ততার পুরোপুরি ইতি ঘটায়নি এবং 'বাংলাদেশ অপারেশনেও' এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে।

আবার অনেক 'বিশেষ অপারেশনে' ব্যাপক ঝুঁকি বা বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। বিশেষ করে যেখানে প্রথাগত কূটনৈতিক দেনদরবার সম্ভব নয়, সেখানে সাধারণত বিভিন্ন সরকারের সাথে 'বিশেষ ব্যবস্থায়' সম্মত হতে হয়। মাঝে মাঝে সে দেশের স্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে পর্যন্ত এ ধরণের কাজে সাহায্যের আহ্বান জানানো হয়ে থাকে। এ

রকম একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল ‘মোশে দায়ান’ ও ‘মোরারজী দেশাই’-এর মধ্যে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত এক গোপন বৈঠক, যার মাধ্যমে একটি ‘বিশেষ’ অপারেশনে বিদেশী গোয়েন্দা বাহিনীর সাহায্য নেয়া হয়েছিল।

(তখন ইসরাইলের সাথে ভারতের কোনো কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না : অনুবাদক)

গ। ‘র’-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ (RAW Objectives)

ব্যাপক অর্থে ‘র’-এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নলিখিত নীতিমালার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত:

১। পার্শ্ববর্তী সকল দেশের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলী ও অবস্থান, ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সরাসরি জড়িত এবং ভারতীয় পররাষ্ট্রনীতিতে তার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী।

২। দ্বিতীয়ত: ‘র’ আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীনের সামজতান্ত্রিক মতভেদ সম্পর্কীয় ঘটনাবলীর ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখবে; কারণ এ দু’পরাশক্তির ভারতীয় সমাজতান্ত্রিকতায় ও অন্যান্য দেশে সরাসরি সম্পৃক্ত হবার সম্ভাবনা আছে।

৩। তৃতীয়ত: পাকিস্তানে বিপুল সমরোপকরণ সরবরাহ সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়, বিশেষ করে ইউরোপীয় বিভিন্ন দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন থেকে অস্ত্র সংগ্রহ ভারতের জন্য বড় উদ্বেগের বিষয়।

৪। সর্বশেষ কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য হলো যে, বিভিন্ন গোত্রের বিপুলসংখ্যক ভারতীয় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাস করে আসছেন, যারা ওই সব দেশে একটি জোরালো অবস্থানে আসীন এবং এ সব প্রবাসী গোয়েন্দা তথ্য জোগাতে পারে। সুতরাং ‘র’-এর উচিৎ এ সব ‘পরবাসী’ ভারতীয়দের সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি রাখা।

অত্যন্ত জটিল ও ‘টেকনিক্যাল’ তথ্য বিভিন্ন সূত্র থেকে জড়ো করে ওগুলোর বিশ্লেষণ করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ ও উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয়। তাই সংস্থার জন্য অত্যন্ত যত্ন ও নিরাপত্তার সাথে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই এর পর এজেন্ট নিয়োগ করতে হয়।

সংস্থার ব্যাপ্তি বাড়ার সাথে সাথে একটি ‘নিয়মিত ক্যাডারের’ প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয় যাদের সামনে দক্ষতা প্রকাশের মাধ্যমে উৎকর্ষ লাভের পথ খোলা থাকে ও পদোন্নতি প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে ‘র’-এর সকলেই ছিল অন্যান্য সংস্থার ধার কৃত সদস্য যাদের জন্য এক সময় ‘পে-স্কেল’ ও পদবীর সাদৃশ্য রক্ষা করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশ বাহিনী থেকে আসা সদস্যদের ‘পদোন্নতি’ ও ‘জ্যেষ্ঠতার’ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়ম রীতি থাকলেও অন্যান্য অনেক বাহিনী ও সংস্থার লোকজন নিয়ে তীব্র সমস্যার সৃষ্টি হয় (বিশেষ করে সশস্ত্র বাহিনীর পদোন্নতি ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো ছিল অন্যদের

অধ্যায় : ৬

‘অপারেশন বাংলাদেশ’

Special Operation : Bangladesh

এমন সময় আসে যখন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা একটি দেশের নিজস্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে। এমনকি যে সব ঘটনার সাথে অল্পবিস্তর বা বহির্মুখী কোনো সম্পর্কই নেই তাও হঠাৎ করে ভীতিকর সমস্যা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরণের সমস্যাকে অন্যভাবে বিবেচনা করলে তা শেষ পর্যন্ত প্রলয় ডেকে আনে।

আবার এমন অবস্থাও হয় যখন এ সব পরিস্থিতিতে সরাসরি কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় না, কারণ বিশ শতকের এ পৃথিবী ‘সভ্য’ বলেই বিবেচিত। এ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসাই একমাত্র সমাধান। যেহেতু প্রায়ই এ সব উদ্যোগ অবচলাবস্থায় পর্যবসিত হয়, তাই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব বিভিন্ন দেশের গোয়েন্দা বাহিনীর ঘাড়ে এসে বর্তায়। বাংলাদেশ হলো এ ধরণের একটি উদাহরণ।

সাধারণত এরূপ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের ইতিবৃত্ত (বিদেশে পরিচালিত গোয়েন্দা কার্যক্রম) কখনই প্রকাশ করা হয় না। গোয়েন্দা কার্যক্রমের বিশেষ প্রকৃতির জন্য, গোপনীয় ‘অপারেশন’সমূহ সব সময় গোয়েন্দা বিভাগে ‘বিশেষ গোপনীয়’ ব্যাপার হিসেবেই আবদ্ধ থাকে। যদি ‘অপারেশন’ ব্যর্থ হয় তবে-এর ফলাফল অপরিবর্তনীয়রূপে প্রকাশ করা হয় এবং এর সাফল্যে কদাচিৎ কোনো মন্তব্য করা হয়। বিশেষ করে জনগণ এ ব্যাপারে অন্ধকারেই থেকে যায়। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে জনগণকে এ সব ‘অপারেশন’ কি জন্য গৃহীত হলো তা জানানো মঙ্গলজনক। (বিশেষ করে যখন জনসাধারণ ভুল তথ্য ও বিরূপ প্রচারণায় বিভ্রান্ত থাকে)।

ক। বাংলাদেশ অপারেশন (The Bangladesh Operation)

বাংলাদেশ অপারেশন (বাংলাদেশে পরিচালিত ‘র’ কার্যক্রমের সার্বিক কোনো ‘ছদ্মনাম’ ছিল না তবে আংশিকভাবে কোনো কোনো খুচরো অপারেশনের ‘কোড’ বা ‘ছদ্মনাম’ ছিল) সম্ভবত মূল গোয়েন্দা কার্যক্রম শুরুর এক বছর পূর্বেই শুরু হয়। এমনকি মুক্তিবাহিনী গঠনের মাধ্যমে পৃথিবী যখন বাংলাদেশ সম্পর্কে অল্পবিস্তর ধারণা করছিল তখন পর্যন্ত অনেকেই বাংলাদেশে ‘র’-এর গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। অবশ্য ইতোমধ্যে ‘বাংলাদেশ অপারেশনের’ প্রথম পর্যায়ের ইতি ঘটেছে। আর দ্বিতীয় পর্যায়ে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে তৈরি হয়ে বসে আছে।

বিদেশী পর্যবেক্ষকরা ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী, বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর সাফল্যকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন জার্মান ‘ব্লীৎস ক্রীগ’ রণকৌশলের অভাবিত সাফল্যের সাথে তুলনা করেছেন। লন্ডনের ‘সানডে টাইমস’ পত্রিকা ১২ ডিসেম্বর ’৭১ সংখ্যায় উল্লেখ করে যে, ‘‘ভারতীয় বাহিনী মাত্র ১২ দিনে প্রতিরোধ চূর্ণ করে ঢাকায় পৌঁছে, যা ১৯৪০ সালে ফ্রান্স দখলে জার্মান ‘ব্লিৎস ক্রীগ’ কৌশলের অতীত সাফল্য স্মরণ করিয়ে দেয়, যেখানে রণকৌশল ছিল একই সাথে গতি, প্রচণ্ডতা ও নমনীয়তা (রণকৌশল পরিস্থিতি বুঝে যাতে পরিবর্তন করা যায়)’’। আজ পর্যন্ত ধারণা করা হয়, ভারতীয় বাহিনী একাই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। যদিও এটা সত্য যে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী অত্যন্ত দক্ষতা ও শৌর্যবীর্যের সাথে যুদ্ধ লড়েছে এবং ইতিহাসে খুব কমসংখ্যক সামরিক অভিযানই এরূপ বিস্ময় ও বিবেচনার দাবি রাখে, কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী ব্যতীত অন্য আরো অনেকে এ ক্ষেত্রে অমূল্য সহায়তা প্রদান করেছেন। শত্রু সীমানায় ও পশ্চাতে থেকে যারা যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে উপযুক্ত সম্মান তাদেরও প্রাপ্য এবং তারা ছিল ‘র’-এর এজেন্ট ও ‘মুক্তিবাহিনীর’ দামাল সৈনিক।

‘র’ মুক্তিবাহিনীর সাথে একত্রে একটি ধ্বংসাত্মক বাহিনীতে পরিণত হয় এবং ভারতীয় বাহিনীকে তথ্য প্রদান আরম্ভ করে। পাকিস্তানী বাহিনীকে কিছু বুঝে ওঠার আগেই পাশ কাটিয়ে ত্বরিত অগ্রসর হবার মাধ্যমে শ্রেষ্ঠতর কৌশলে পরাজিত করা সে জন্যে সম্ভব হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন রণাঙ্গনে জয়লাভ করার আগেই ভারতীয় বাহিনী যুদ্ধ জয় করার সুযোগ লাভে ধন্য হয়।

কোনো সন্দেহ নেই যে, এ সামরিক অভিযানের সাফল্যে অন্য অনেক বিষয়ই সহায়ক শক্তি হিসেবে অনুঘটকের কাজ করেছে, কিন্তু ‘র’ এর সমর্থন এক্ষেত্রে ‘চূড়ান্ত তাৎপর্য’ বহন করে।

খ। প্রারম্ভিক তথ্যাদি (Early Reports)

পাকিস্তানী চিন্তা-ভাবনা ও পরিকল্পনা সম্পর্কে ‘র’-এর মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম শুরুর এক বছর পূর্বেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। লন্ডনে গোয়েন্দা সংস্থার ‘পররাষ্ট্র বিভাগে’ কর্মরত একজন এজেন্ট পাকিস্তানী কূটনীতিকের মন্তব্য থেকে এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহে সমর্থ হন। সেখানে পাকিস্তানী কূটনীতিক ইশারা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ব পাকিস্তানী বাঙালি মুসলিমদের বিরুদ্ধে ‘‘ব্যবস্থা গ্রহণে মনস্থ করেছে’’, পাকিস্তানী কূটনীতিকের ভাষায় “ওই সব মূর্খ বাঙালিদের এমন শিক্ষা দেয়া হবে যা তারা সারাজীবনেও ভুলবে না।’’ এ ধরণের একটি মন্তব্য গোয়েন্দা এজেন্টের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই প্রতীয়মান হয় এবং সে অতিদ্রুত এ ব্যাপারটি দিল্লিকে অবহিত করে। গোয়েন্দা সদর দপ্তরের ‘পাকিস্তান বিভাগে’ পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তান থেকে অন্যান্য আরো সংগৃহীত তথ্যে পাকিস্তানী কূটনীতিকের ‘লন্ডন মন্তব্যের’ সমর্থনে একটি পরিকল্পনার চিত্র ধীরে ধীরে পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। এ সমস্ত গোয়েন্দা তথ্যাদি শীঘ্রই ‘সংযুক্ত গোয়েন্দা কার্যনির্বাহী পরিষদে’ পাঠানো হয়। অবশ্য সে সময় এ ধরণের পরিকল্পনার কথা সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস করা হয় এবং ব্যাপারটি সে মুহূর্তে ফেলে রাখা হয়।

গ। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (Agartala Conspiracy Case)

পূর্ববর্তী ঘটনার সূত্র ধরে ঘটে যাওয়া একটির পর একটি (কোনোটি বড় মাপের ও কোনটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়) ঘটনাকে ক্রমানুযায়ী বিস্তারিত বর্ণনা করা কষ্টসাধ্য। শেষ পর্যন্ত 'র'-এর 'বাংলাদেশ অপারেশন' এ যুক্ত হবার জন্য ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর একটি পরিষ্কার সারসংক্ষেপ প্রকাশ করতে হলে একজনকে অবশ্যই ১৯৬৮ সালে 'র'-এর জন্ম সালের পরপর ঘটে যাওয়া গোয়েন্দা কার্যাদির পর্যালোচনা করতে হবে। কিন্তু ততোদিনে ভারতীয় এজেন্টরা পূর্ব পাকিস্তানের 'মুজিবপন্থী' (Pro-Mujib) একটি অংশের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেছে। আগরতলায় ১৯৬২-৬৩ সালে ভারতীয় এজেন্ট ও 'মুজিবপন্থীদের' মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে পরবর্তী গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়।

কর্নেল 'মেনন' (Menon) যিনি ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী ও মুজিবপন্থী অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী ছিলেন (আসলে কর্নেল মেনন ছিল শংকর নায়ারের গৃহীত ছদ্মনাম), তিনি আগরতলা বৈঠকের পর ইঙ্গিত পান যে, 'মুজিব পন্থী' গ্রুপ আন্দোলন শুরু করার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব। 'কর্নেল মেনন' তাদের এই বলে সতর্ক করে দেন যে, তার মতে 'সঠিক ফলদায়ক সিদ্ধান্তে আসার সময় এখনো হয়নি।' এ ক্ষেত্রে তারা যে পরিকল্পনা নিয়েছে তা অসম্পূর্ণ ও এভাবে কাজ না হবার সম্ভাবনাই বেশি। কর্নেল মেনন ঠিক কথাই বলেছিলেন- 'তারা অস্ত্রের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে' এবং ঢাকাস্থ 'ইস্ট বেঙ্গল রাইফেলস' (এখানে আসলে হবে EPR বা ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস-অনুবাদক) অস্ত্রাগারে হামলা চালায়, কিন্তু এ প্রাথমিক প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। আসলে এ পদক্ষেপ একটি ধ্বংসাত্মক ফলাফল ডেকে আনে, ঠিক যেরূপ 'কর্নেল মেনন' ধারণা করেছিলেন। এর কয়েক মাস পর ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ সালে পাকিস্তান সরকার ঘোষণা করে যে, ভারতের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করার চক্রান্ত করার জন্য ২৮ জন পাকিস্তানীর বিচার করা হবে। শেখ মুজিবকেও বারদিন পর একজন দোষী হিসেবে জড়িত করা হয়। এ মামলাই পরবর্তীতে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে পরিচিতি পায়। অমানবিক নির্যাতনের মাধ্যমে কামালউদ্দীন আহমেদের 'সত্য বলে উল্লেখ' করা স্বীকারোক্তির ওপর ভিত্তি করে অভিযোগ গঠন করা হয়। পাকিস্তানী পত্রিকা 'ডন' (Dawn)-এ হাইকোর্টের বিচারকার্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাতে উল্লেখ করা হয়, ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে 'মেজর মেনন' ও 'কর্নেল ত্রিপাথী' নামের দু'জন ভারতীয় এজেন্টের যোগাযোগ ছিল। এটা নিশ্চিতই যে, পাকিস্তান সরকার ভারতকে জড়ানোর চেষ্টায় দু'জন এজেন্টের উল্লেখ করে, কিন্তু তাদের প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পূর্ণ তথ্যের ছিটেফোঁটা লাভেও ব্যর্থ হয়। তারা দু'জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা নির্ধারণেই ভুল করে বসে; যারা আসলে ছিলেন 'কর্নেল মেনন' ও 'মেজর ত্রিপাথী' এবং পাকিস্তানীদের ধারণা করা এর উল্টোটা নয়।

ঘ। ‘র’-এর কার্যক্রম বৃদ্ধি (RAW Steps Up It’s Activitiess)

ইতোমধ্যে গোয়েন্দা দপ্তরের (IB= Intelligence Bureau) পাকিস্তান শাখা ‘র’-এর নতুন প্রশাসনিক কাঠামোয় বদলি হয় এবং তিনজন কর্মকর্তা সেখানে অবিরত সংগৃহীত তথ্যাদি পর্যালোচনায় নিয়োজিত হন। এদের মধ্যে ছিলেন ‘র’-এর যুগ্ম পরিচালক পি এন ব্যানার্জি, যিনি পূর্বাংশের প্রধান ও তাঁর সদর দপ্তর ছিল কলকাতায় এবং এস, শংকর নায়ার, যিনি দিল্লিতে ‘পাকিস্তান শাখা’র দায়িত্বে ছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে একটি গোপন সংস্থা গড়ে তোলার কাজ ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে ‘শত গুপ্তচরের’ বছর এভাবেই শুরু হয়।

পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের পূর্বাংশের জনগণ ও এর নেতৃবর্গের প্রতি নিবর্তনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণই প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে ওঠার প্রাথমিক কারণ বলে বিবেচিত হয়। *কর্নেল মেননের অবিরাম ভ্রমণ ও যোগাযোগের জন্য সীমান্তব্যাপী ‘র’-এর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র খোলা হয় এবং কর্নেল মেননের সাথে পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরের প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের নিবিড় যোগাযোগ ওইসব তরুণ, অবিশ্রান্ত ও উৎসর্গীকৃত গুপ্ত যোদ্ধাদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি করে। এভাবে ভ্রমণের ফলে ‘স্থানীয় কেন্দ্র প্রধান’ নির্বাচনের বিশেষ সুবিধা হয়। এ সব কেন্দ্র প্রধানদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন কর্নেল এম এ জি, ওসমানী (যিনি পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনী ও স্বাধীনতা যোদ্ধাদের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত হন) নেতৃত্বাধীন মেজর খালেদ মোশাররফ (পূর্বে একজন সামরিক স্টাফ অফিসার-ব্রিগেড মেজর), মেজর শফিউল্লাহ ও আব্দুল কাদের সিদ্দিকী যিনি বাঘা সিদ্দিকী ছদ্মনামে পরিচিত ছিলেন এবং পরবর্তীতে ‘মুক্তিবাহিনী’ ও ‘র’ এজেন্টদের মধ্যে যোগাযোগকারী রূপে আবির্ভূত হন।*

ইতোমধ্যে যখন বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন শেষ হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে ‘র’ এজেন্টদের মাধ্যমে (যারা ভারতীয় বিভিন্ন সংস্থা থেকে অস্থায়ীভাবে ‘র’-এর নিয়োগকৃত হয়) আন্দোলনকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান শুরু হয়, তখনই সেই ভয়াবহ ‘কালো রাত্রির’ পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে। অনেক পরে, শেখ মুজিব বলেছিলেন, ‘‘আজ যদি হিটলার বেঁচে থাকতেন, তবে তিনিও লজ্জিত হতেন...’’ শেখ মুজিব প্রকারান্তরে বাংলাদেশকে ‘ধর্ষণের’ কথাই উল্লেখ করেন।

ঙ। পূর্ব-পাকিস্তানী নেতাদের দাবি (Demands of East Pakistani Leaders)

বাংলাদেশ আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে ফিরে যেতে হয়, যখন বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে একটি গণজোয়ারের সৃষ্টি হয়েছিল। (আসলে লেখক এখানে ফেব্রুয়ারি মাসের বদলে ভুলে মার্চ মাস উল্লেখ করেছেন-অনুবাদক)। এরপর ‘র’-এর সূত্র মতে, ক্রমানুযায়ী ঘটে যাওয়া ঘটনার ফলশ্রুতিতে ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে বিদ্রোহের চিহ্ন সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম সার্থক দিকনির্দেশক ছিল ১৯৫২ সালের মার্চ মাসের ‘রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন’। পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতি নগ্ন ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ছিল অবশ্যম্ভাবী এবং বাঙালিদের ঘৃণাভরে উল্লেখ করা হয়

অধ্যায় : ৭

‘অপারেশন সিকিম’

’Special Operation : Sikim’

‘অপারেশন বাংলাদেশ’ শেষ। এক মাস পর একজন ঊর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা ‘র’ প্রধানের অফিসের বারান্দা দিয়ে হেঁটে (যাচ্ছিলেন) সভাকক্ষের দরজার নিকটে এসে থামলেন। টোকা দেয়ার পূর্বেই তাঁকে সাদরে ভিতের নিয়ে যাওয়া হলো।

সেখানে চারজন লোক নীরবে বসে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন। শান্ত নীরব পরিবেশ তপ্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো মুহূর্তে, ‘‘ভালো দেখিয়েছেন, কাজটা ভালোভাবেই হয়েছে (পাকিস্তান দ্বিখণ্ডীকরণ), এখন আমাদের পরবর্তী কাজ নিয়ে চিন্তা করতে হবে।’’ বাকি চারজন বিস্মিত হয়ে ভেবেই পেলেন না ‘এরপর আবার কি?’ ‘‘সিকিম, ভদ্রমহোদয়গণ সিকিম, দেখুন এটা নিয়ে কি বের করতে পারেন। আপনারা এ ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে ২৪ মাস সময় পেতে পারেন, অবশ্য সরকার যদি আদৌ কোনো ব্যবস্থা নেয়ার পরিকল্পনা নেয়’’। বাকি আলোচনায় সকলেই একটার পর একটা আশ্চর্য অথচ সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ কথাই শুনলেন আর নতুন চিন্তার সূত্রগুলো সাজাতে লাগলেন গোয়েন্দা মস্তিষ্কের গ্রন্থিতে। অবশ্য ওই ক্ষমতাবান কর্মকর্তার এটা কোনো অফিসিয়াল সভা ছিল না বটে তবুও সিকিম নিয়ে আনঅফিসিয়াল চিন্তাভাবনা এভাবেই শুরু।

ক। ‘অস্থিতিশীল সিকিম’ (Turbulent Sikim)

তিব্বত, নেপাল, ভুটান এবং পশ্চিম বাংলা দ্বারা বৃত্তাবদ্ধ হিমালয়ের পূর্বে অবস্থিত সিকিম একটি মনোমুগ্ধকর রাষ্ট্র। এর ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব নির্ভর করে তিব্বতের (চীন) ও সিকিমের মধ্যবর্তী ভারতের অবস্থানের উপর (১৯৬২ সালে যুদ্ধে সিকিম চীনাদের কাছে ভারতকে দু’ভাগে ভাগ করে ফেলার একটি চমৎকার স্থান বলে বিবেচিত হয়েছিল, ১৯৭১ এর যুদ্ধেও ভারতের ভয় ছিল যে পাকিস্তান আর্মি হয়তো পূর্ব পাকিস্তানে তেঁতুলিয়া সীমান্ত হয়ে সিকিমের মাধ্যমে ভারতকে ভাগ করে ফেলবে, যার ফলশ্রুতিতে ভারতের পূর্বাঞ্চল হবে সরবরাহশূন্য আর সে অবস্থায় পূর্ব-পাকিস্তানকে ঘিরে পশ্চিম ও পূর্ব উভয় পাশে যুদ্ধ চালনা করা হবে অসম্ভব-অনুবাদক)।

চারটি প্রাচীন সম্প্রদায় সিকিমের আদি ও মূল অধিবাসী, এগুলো হলো লেপচা, ভুটিয়া, নেপালিজ ও সন্‌স। সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দা হলো লেপচারা, যারা আবার রঙ্গ-পা বা গিরিখাদের উপজাতি বলেও পরিচিত। এরা সকলেই আসাম থেকে এসে সিকিমে সর্বপ্রথম বসিত স্থাপন করে। তারপর চৌদ্দশ শতাব্দীতে তিব্বত থেকে আসে ভুটিয়ারা,

যাদের অনুসরণ করে আঠার উনিশ শতাব্দীতে নেপালীরা এসে বসবাস শুরু করে। সিকিমের শাসনকর্তা ছিল লেপচা-ভুটিয়া জাতিভুক্ত, যারা নীতির জন্য নেপালীদেরকে শাসনকার্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতো, যদিও নেপালীদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। এই স্বজনপ্রীতিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল শাসকগোষ্ঠী ও সংখ্যাগুরু শ্রেণীর মধ্যে অবিরত রেষারেষির অন্যতম কারণ।

সিকিমের ইতিহাস জাতিগত দ্বন্দ্ব ও অস্থিতিশীলতার ইতিহাস। এর সাথে ছিল পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলোর সাথে ক্রমাগত হানাহানি ও দীর্ঘস্থায়ী কোন্দল। ভারতে বৃটিশ রাজশক্তির অনুপ্রবেশের পর সিকিমও বৃটিশ রাজনৈতিক কূটচালে পতিত হয়। প্রথম বড় ধরণের ধাক্কাটি আসে ১৮৩৫ সালের সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে যেখানে উল্লেখ ছিল “গভর্ণর জেনারেল মহাশয় দার্জিলিং পার্শ্ববর্তী পাহাড়শ্রেণী অধিগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা ব্যাক্ত করিয়াছেন-এ জন্য যে, ইহার ঠাণ্ডা মনোরম আবহাওয়া সরকারি চাকুরেদের রোগমুক্তি লাভে সহায়ক হইবে। আমি- সিকিমের রাজা, সদাশয় গভর্নর জেনারেলের সহিত বন্ধুত্বের সম্মানে, দার্জিলিংকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বরাবর উপহারস্বরূপ প্রদান করিলাম।”

১৮৫৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সম্পাদিত এ চুক্তির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সিকিম রাজা বিশেষ কিছুই ভাবেননি, যা ২৬ বছর পর সিকিমকে ভাবনায় ফেলেছিল।

এরপর অবিরাম সংঘর্ষ চলতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে ১৮৫০ সালে ‘দণ্ড বিধায়ক’ সমন্বয়ে একটি বৃটিশ অভিযাত্রীদল পাঠানো হয় যার অনুসরণ করে ১৮৬১ সালে আরো বড় একটি দল সিকিমকে ১৮৬১ সালের চুক্তিতে আসতে বাধ্য করে। এ চুক্তির প্রস্তাবনায় উল্লেখ করা হয়, “সিকিমে মহারাজার রাজ কর্মকর্তা ও পারিষদবর্গ অবিরাম দুর্ব্যবহার ও লুটতরাজ চালাইতেছে এবং মহারাজার বৃটিশ সরকারকে স্বাচ্ছন্দ্য প্রদানে অমনোযোগিতা-বৃটিশ সরকারের সহিত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা পূর্বের মধুর সম্পর্কের অবনতির কারণ; এ সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া বৃটিশ বাহিনী অবশেষে সিকিম দখল করিতে বাধ্য হইলো।”

এদিকে সিকিম-তিব্বত বৈরীতার অবসান হয় ১৮৯০ সালের এ্যাংলো-চাইনিজ কনভেনশনের মাধ্যমে। সিকিম, বৃটিশ সরকারের একটি ‘আশ্রিত রাজ্য’ হিসেবে চীনের স্বীকৃতিও লাভ করে। ১৮৮৯ সালে ক্লড হোয়াইট প্রথম বৃটিশ রাজনৈতিক অফিসার হিসেবে সিকিমে মনোনয়ন লাভ করেন, যিনি পরবর্তীতে সিকিমের শাসকে পরিণত হন। এরপর ১৯১৮ সালে আবার মহারাজার নিকট রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, কিন্তু সিকিম বৃটিশের ‘আশ্রিত রাজ্য’ হিসেবেই থেকে যায় এবং ১৯৩৫ সালের ভারতীয় সংবিধান অনুযায়ী বৃটিশ ভারতের একটি রাজ্যে পরিণত হয়।

১৯৪৬ সালে ভারতের ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ঘোষণা করলেন “একদিকে রাজ্যসমূহ অন্যদিকে বৃটিশ রাজ এবং বৃটিশ ভারতের মাঝে রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থা নিরূপণে